.

শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা
Industrial Welfare and Social Security

৭

শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা উত্তম শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখার অন্যতম পদ্ধতি। শ্রমিক-কর্মচারীরা সাধারণত নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এই নিরাপত্তাহীনতার ক্ষেত্রে শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা একটি রক্ষাকবচ। তাই, এই ইউনিটে শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা ব্যবসায় প্রশাসনের শিক্ষার্থীদের শিল্প-সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ
এ ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ- ৭.১ : শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা: পরিচয় পাঠ- ৭.২ : শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা: কার্যক্রম ও সমস্যা	

পাঠ ৭.১ শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা: পরিচয়
Industrial Welfare and Social Security: Introduction

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিল্প-কল্যাণ কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- সামাজিক নিরাপত্তা কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- শিল্প-কল্যাণের উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন;
- সামাজিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিল্প-কল্যাণ ব্যবস্থার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সব ধরনের কর্মচারী যথা ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক সকলের জন্য দেওয়া হয়। নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও মানবীয় পরিবেশ শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজে উৎসাহিত করে ও সংগঠনের প্রতি অনুগত করে। এই পাঠে শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে আমরা শিল্প-কল্যাণের সংজ্ঞা নিয়ে কথা বলব।

শিল্প-কল্যাণের সংজ্ঞা
Definition of Industrial Welfare

আমরা জানি শ্রমিক-কর্মচারীরা সংগঠনের প্রাণ। তাদের অবদান ছাড়া কোনো সংগঠন চলতে পারে না। সে জন্য তাদেরকে যত দূর পারা যায় স্বস্তিতে ও নিরাপদ রাখা যায় সে চেষ্টা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা করে থাকে। উদ্দেশ্য হলো তাদের সন্তুষ্টি ও আনুগত্য অর্জন করা। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য আরামপ্রদ ও স্বস্তিকর ভৌত ও মানবীয় কার্যপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ও শ্রমিক-কর্মচারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য মজুরির অতিরিক্ত যে আর্থিক ও অ-আর্থিক সুবিধাসমূহ প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয় তাকে শিল্প বা কর্মচারী কল্যাণ নামে অভিহিত করা হয়।

টড বলেন, কর্মচারী কল্যাণ বলতে বুঝায় কর্মচারীদের মানসিক বা সামাজিক স্বস্তি ও উন্নয়নের জন্য প্রদত্ত মজুরির অতিরিক্ত যা শিল্পে জরুরি নয় এমন যা কিছু করা হয়। [Employee welfare means anything done for the comfort and improvement, intellectual or social, of the employees over and above the wages paid which is not a necessity of the industry.]

আই. এল. ও. (১৯৬৩) এক রিপোর্টে মত প্রকাশ করে, "শ্রমিকদের কল্যাণ বলতে বুঝতে হবে সেই সব সেবা, সুবিধা ও জীবন-স্বস্তিকারক মনোরম সুবিধা সম্বলিত পরিবেশ, যা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বা কাছাকাছি প্রতিষ্ঠা করা হয় যেন সেখানে নিয়োজিত ব্যক্তিরা স্বাস্থ্যকর, সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে পারে এবং যা উত্তম স্বাস্থ্য ও উচ্চ মনোবলের জন্য সহায়ক ও ব্যক্তিজীবন সুন্দর মনোরম করার সুযোগ-সুবিধাসমূহ প্রদান করে।"

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, শিল্প-কল্যাণ শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য করা হয়। এটি স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ হতে পারে, আবার সরকারি ব্যবস্থায় হতে পারে। যেভাবেই হোক না কেন, শিল্প-কল্যাণ শ্রমিক-কর্মচারীদের বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক ভালোর জন্য করা হয়। এ সব কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারীদের সাংগঠনিক কাজে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন ও মজুরির অতিরিক্ত যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করে তাদের আর্থিক উন্নতি, সামাজিক, নৈতিক অবস্থার প্রসার ও মানসিক প্রশান্তির উন্নয়নসাধন করা হয় এবং ভৌত সুবিধার উন্নয়ন করার জন্য যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, সেগুলোকে সামগ্রিকভাবে শিল্প বা কর্মচারী কল্যাণ বলা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা

Definition of Social Security

সাধারণ অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা বলতে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ নেই এমন দৈব বিপত্তির বিরুদ্ধে মানুষকে প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তাকে বোঝায়। সামাজিক নিরাপত্তার ধারণাটি হলো এই যে, রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জীবনের সকল প্রধান অনিশ্চিত অবস্থায় ন্যূনতম মানসম্পন্ন বস্তুগত কল্যাণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব নেবে। অর্থাৎ, নাগরিকের জীবনের অসহায় অবস্থা যেমন: অসুস্থতা, প্রসূতিকালীন সময়, শারীরিক অক্ষমতা, দুর্ঘটনা, শিল্প রোগ, বেকারত্ব, বৃদ্ধ বয়স, পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু ও অন্যান্য জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্র আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। রাষ্ট্র কর্তৃক এই দায়িত্ব গ্রহণ ব্যবস্থার নাম হলো সামাজিক নিরাপত্তা।

শিল্পবিপ্লবের পর কারখানা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। অনেক লোক কারখানায় কাজ করতে শুরু করে। কারখানা ব্যবস্থার সাথে নানা ধরনের রোগ ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি জড়িত আছে। এ প্রেক্ষিতে কারখানায় কর্মরত মানুষদের চাকুরির নিরাপত্তাহীনতা, ছাঁটাই, কারখানা বন্ধ হয়ে চাকুরি হারানো, নারী কর্মচারীদের নিরাপত্তা, মাতৃত্বকালীন অবকাশ, কর্মচারীদের চিকিৎসা ইত্যাদি নানা দৈব কারণপ্রসূত নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে চলে আসে। কর্মচারীদের এ সব অসহায় অবস্থায় তাদেরকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করার দায়িত্ব কারখানা মালিক বা ব্যবস্থাপকদের গ্রহণ করতে হয়। শিল্প-সম্পর্ক শাস্ত্রে শিল্পমালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃক এই দায়িত্ব গ্রহণ ব্যবস্থার নাম হলো সামাজিক নিরাপত্তা।

ভাগোলিওয়াল (১৯৯৭) বলেন, "সামাজিক নিরাপত্তা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, ব্যক্তিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত একটা ব্যবস্থা।" [Social security is a device provided by society against a number of insecurities arising out of natural, social, individual and economic causes]

আই.এল.ও. (১৯৪৯)-র মতানুসারে, "সামাজিক নিরাপত্তা হলো সমাজের সদস্যরা আক্রান্ত হয় এমন কতিপয় ঝুঁকির বিরুদ্ধে সমাজ কর্তৃক যথাযথ সংগঠনের মাধ্যমে প্রদত্ত নিরাপত্তা। [Social security is the security that society furnishes through appropriate organization against certain risks to which its members are exposed.]

অতএব, উপর্যুক্ত বিবরণীর আলোকে বলা যায়, সামাজিক নিরাপত্তা হলো শিল্প সমাজ তথা বৃহত্তর সমাজ কর্তৃক এর সদস্যদের প্রাকৃতিক, সামাজিক, ব্যক্তিক ও অর্থনৈতিক দৈব বিপত্তির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

এবার শিল্প-কল্যাণের উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা করা হবে।

শিল্প-কল্যাণের উদ্দেশ্যাবলি

Objectives of Industrial Welfare

শিল্প-কল্যাণ ব্যবস্থা কতকগুলো উদ্দেশ্যাবলি সামনে রেখে নেওয়া হয়। সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১। **মানবীয় কল্যাণ:** মানব জীবন পূর্ণ করতে ও সম্মানজনক জীবন যাপন করতে অনেক বাস্তব সুযোগ-সুবিধা লাগে। শ্রমিক-কর্মচারীরা নিজেরা এসব সুযোগ-সুবিধা সামর্থ্যের অভাবে অর্জন করতে পারে না। যেমন প্রশিক্ষণ, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, আবাসন, বিনোদন, সুপেয় পানি, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য বিধি, চিকিৎসা, ধৌতকরণ সুবিধা, ক্যান্টিন, শিশু পরিচর্যা ইত্যাদি শ্রমিক-কর্মচারীরা নিজেরা ব্যবস্থা করতে পারে না। শিল্পপ্রতিষ্ঠান এ সব সুযোগ-সুবিধা শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রদান করার মাধ্যমে মানবীয় কল্যাণ নিশ্চিত করে। শিল্প-কল্যাণ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক-কর্মচারীদের মানবীয় কল্যাণের মাধ্যমে মনোরম ও আকর্ষণীয় কার্যপরিবেশ প্রদান করে তাদের কাজের প্রতি প্রেষিত করা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ করা।

২। **আর্থিক কল্যাণ:** প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের সার্বিক জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ভৌত ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ সম্পাদন করতে হয়। এই সব কাজ করার জন্য যে অর্থ দরকার তা শ্রমিক-কর্মচারীদের থাকে না। ফলে, তারা কার্যদক্ষতা বাড়াতে পারে না, প্রতিষ্ঠানও বর্ধিত উৎপাদন পায় না। এ প্রেক্ষিতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের আর্থিক ব্যয় বহন করে। তাছাড়া, শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবন-মান ঠিক রাখার জন্য উৎসবভাতা, আবাসন ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, বিনোদন ভাতা, পরিবহন ভাতা, প্রণোদনা বোনাস ইত্যাদি আর্থিক ভাতা প্রদান করে। এ সকল কার্যক্রম শিল্প-কল্যাণ ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। শ্রমিক-কর্মচারীদের আর্থিক কল্যাণের মাধ্যমে তাদেরকে উন্নত কর্মক্ষমতা ও জীবন-মান নিশ্চিত করলে তারা সংগঠনের প্রতি অনুগত থাকে এবং তাদের কাজের প্রতি আগ্রহী হয়। ফলে, শিল্প-বিরোধ লোপ পায় ও সার্বিক বিচারে প্রতিষ্ঠান লাভবান হয়।

৩। **নাগরিক কল্যাণ:** শিল্প-কল্যাণ ব্যবস্থার আর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক-কর্মচারীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। মানবিক ও আর্থিক কল্যাণ ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও মানব মর্যাদাবোধের উন্নয়ন ঘটে। তাদের নৈতিক ও বৌদ্ধিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ভালো মানুষ ও সুনাগরিক তৈরী করা হয়। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তারা নিজেদের সম্মানজনক অবস্থানে দেখতে পায়। এ প্রেক্ষিতে শিল্প-কল্যাণ ব্যবস্থা শ্রমিক-কর্মচারীদের মূল্যবান নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং তারা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। ফলে, দেশ ও প্রতিষ্ঠান উভয়েই উপকৃত হয়।

৪। **সামাজিক কল্যাণ:** শিল্প-কল্যাণ ব্যবস্থার আর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক-কর্মচারীদের সামাজিক কল্যাণ করা। শ্রমিক শ্রেণী সমাজের দুর্বল অংশ। তাদের সামাজিক অবস্থান ও স্বীকৃতি প্রত্যাশিত মানের নয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠান, শ্রমিকসংঘ ও সরকার তাদের জন্য সামাজিক অবস্থান উন্নত করার লক্ষ্যে আবাসন, শিক্ষা, বিনোদন,আর্থিক সুবিধা ইত্যাদি সহায়তা দিয়ে থাকে। এ সব কাজের মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারীদের সামাজিক মানমর্যাদা ও স্বীকৃতি বাড়ে।

৫। **বিনোদন:** বিনোদন মানুষের মানসিক ও শারীরিক উভয় সুস্বাস্থ্যের জন্য দরকার। কিন্তু বিনোদন ব্যয়বহুল, তাই শ্রমিকদের পক্ষে তা বহন করা সম্ভব হয় না। এ জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিনোদনের ব্যবস্থা করলে শ্রমিক-কর্মচারীদের মনোদৈহিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে, তারা কাজে উৎসাহ পায় ও প্রতিষ্ঠান বর্ধিত উৎপাদন পায়।

এবার দেখা যাক সামাজিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্যাবলি কী কী।

সামাজিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্যাবলি

Objectives of Social Security

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যাবলি নিচে আলোচনা করা হলো:

১। **শ্রমিক-কর্মচারীদের দৈবদুর্বিপাকে নিরাপত্তা দেওয়া:** সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক-কর্মচারীদের দৈবদুর্বিপাকে নিরাপত্তা দেওয়া। অনেক ঘটনা আছে যার উপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এগুলোকে দৈবদুর্বিপাক বলে। যেমন করোনা মহামারি, দুর্ঘটনা, অর্থনৈতিক মন্দা, কোম্পানির বাজার পড়ে যাওয়া ইত্যাদি। এ সকল কারণে কারখান বন্ধ হয়ে যেতে পারে, বেকারত্ব দেখা দিতে পারে, শ্রমিক-কর্মচারীদের আয় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে, শ্রমিক-কর্মচারীদের আর্থিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও পারিবারিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এমতাবস্থায়, শ্রমিক-কর্মচারীদের সহায়তা দিয়ে টিকিয়ে রাখার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২। **আর্থিক সহায়তা:** সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক-কর্মচারীদের দৈবদুর্বিপাকে নিরাপত্তা দেওয়া। এর জন্য প্রয়োজনে আর্থিক সুবিধা নানা প্রকারে প্রদান করা হয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মচারীর আকস্মিক মৃত্যু হলে থোক আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়, দুর্ঘটনা ঘটলে চিকিৎসার আর্থিক ব্যয় বহন করা হয়, কর্মচারীদের সন্তানদের আর্থিক শিক্ষা বৃত্তি দেওয়াসহ নানাবিধ আর্থিক সহায়তা করা হয়। এ সব ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া হয়।

৩। **সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করা:** ধনতান্ত্রিক সমাজ বা আমাদের মতো পরিবর্তন-প্রক্রিয়াধীন সামন্ত সমাজ বা নব্য ধনতান্ত্রিক সমাজে 'যার ধন নাই, তার মান নাই'। রাষ্ট্র তার মানহীন নাগরিকদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সম্মানজনক জীবনযাত্রার জন্য রাষ্ট্র সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করে,

সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করে, বেকারভাতা দেয়, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে, স্বল্প ভাড়ায় আবাসন সুবিধা প্রদান করে, বার্ধক্য ভাতা প্রদান করে। এ ধরনের নানা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানও সামাজিক নিরাপত্তার অধীনে আবাসন সুবিধা বা ভাতা, পরিবহন সুবিধা, কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য কারখানা প্রাঙ্গনে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা, সপরিবারে কর্মচারীদের বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, কারখানার নিকটে বাজার প্রতিষ্ঠা করা, ব্যাংক ও অন্যান্য যোগাযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করাসহ নানাবিধ সুবিধা প্রদান করে সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করতে পারে।

৪। **পরিবার প্রতিপালনে সহায়তা দান:** সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবার প্রতিপালনে অসচ্ছল নাগরিকদের সহায়তা করা। অনেক শ্রমিক-কর্মচারী আছে যাদের আয় পরিবারের ব্যয় চালানোর জন্য যথেষ্ট না। স্বল্প আয়ের এই সব নাগরিকদের পণ্যদ্রব্য সরবরাহ, স্বল্প ভাড়ার আবাসন, পণ্য ক্রয় কুপন, দরিদ্রের জন্য দোকান, রেশন ব্যবস্থায় স্বল্প দামে পণ্য সরবরাহ ইত্যাদি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যারা বেকার নাগরিক তাদের জন্য একই রকম সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানও বাট্টা দোকান বা সমবায় দোকান চালু করে কর্মচারীদের পরিবার প্রতিপালনে সহায়তা দান করার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকে বা দিতে পারে।

৫। **বিমা সুবিধা প্রদান করা:** সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য স্বাস্থ্য বিমা, গ্রুপ বিমা করার মাধ্যমে কর্মচারীদের দৈবদুর্বিপাকের সময় হাসপাতাল সেবা ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা। কর্মচারী যত বৃদ্ধ হয়, ততই তার চিকিৎসা খরচ বাড়তে থাকে। অবসরের পর এই ব্যয় আরও বাড়ে। সে জন্য প্রতিষ্ঠান চাকুরিকালীন সময়ে এই বিমা নিরাপত্তা দিবে এবং সরকার অবসরকালীন সময়ে সর্বজনীন বিমা স্কিমের মাধ্যমে এই বিমা সুবিধা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদান করে।

৬। **স্বাস্থ্যসেবা প্রদান:** সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক-কর্মচারীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা। একজন শ্রমিক-কর্মচারী তার আয় দিয়ে এই স্বাস্থ্য সেবা লাভ করতে পারে না। সে জন্য সরকার ও প্রতিষ্ঠান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে। আর দৈবদুর্বিপাকে সময় এই স্বাস্থ্য সেবা প্রদান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেননা, এই অবস্থায় বিরাট সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী চাকুরি হারায়, আংশিক আয় হারায়। আর বেকার মানুষ নতুন চাকুরি পায় না। এমতাবস্থায়, শ্রমিক-কর্মচারীসহ এই বিপর্যয়ের শিকার নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে বাঁচিয়ে রাখা হয়।

৭। **বার্ধক্যে সহায়তা করা:** বার্ধক্য মানুষকে জরাগ্রস্থ করে ও কর্মক্ষমতা নষ্ট করে। ফলে, তার জন্য জীবন ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সে সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে আর্থিক বার্ধক্য ভাতা বা সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা, স্বাস্থ্য বিমার নিরাপত্তা, হাসপাতাল সেবা, আবাসন ভাতা বা আবাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারী বা যে কোনো নাগরিকের জীবনযাপন নিরাপদ, আরামপ্রদ ও আনন্দময় করা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি চাকুরি করত, তারাও গ্র্যাচুইটি, পেনশন, বিনোদন ক্লাবের জীবন সদস্যপদ, শরীরচর্চা কেন্দ্রের আজীবন সদস্যপদ ইত্যাদি স্কিমের মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর বার্ধক্য জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

এবার আলোচ্য বিষয় হলো শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব।

শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব

Importance of Industrial Welfare and Social Security

শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নানাভাবে মানুষের জীবন ও জগৎ সুন্দর করে। তাই, এই ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুত্ব নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

১। **উত্তম জীবন যাপন মান:** শ্রমিক-কর্মচারীদের পরিবার নিয়ে সমাজে বসবাস করতে হলে পরিবারের বৈষয়িক ও মানসিক প্রয়োজন মিটানোর সক্ষমতা থাকা দরকার। কিন্তু তাদের আয় কম হওয়ায় তারা জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে পারে না। এ পর্যায়ে শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সহায়তা পাওয়ায় তারা পরিবারের প্রয়োজনীয় জিনিস ও উপাদান সংগ্রহ করতে পারে ও উত্তম জীবনযাপন মান বজায় রাখতে পারে। ফলে, শ্রমিক-

কর্মচারীরা দেহ-মনে সুস্থ্য থাকে এবং তাদের কাজের শক্তি ও প্রেরণা সমুন্নত থাকে। এই বিচারে শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ।

২। **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** মানুষ যদি দেহ-মনে সুস্থ থাকে, তা হলে তাদের কাজের শক্তি ও স্পৃহা বজায় থাকে। শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা শ্রমিক-কর্মচারীদের আর্থিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক ও বৈষয়িক সহায়তা তাদের কর্মদক্ষতা ও প্রেষণা বাড়ায়। ফলে, শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অবদানের কারণে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের তথা দেশের শ্রমিক শ্রেণির মোট উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৩। **শ্রমশক্তির স্বীকৃতি:** ক্রমবর্ধমান বৃহদায়তন উৎপাদন ও গণবিক্রয়ের পেছনে শ্রমশক্তির অবদান অপরিহার্য। শ্রমশক্তির অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। এ বিবেচনায় শ্রমশক্তির স্বীকৃতি প্রদানের জন্য শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৪। **শ্রমিক-কর্মচারীকে সামগ্রিক সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি:** শিল্প মনোবিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নানা গবেষণায় প্রমাণিত যে, প্রত্যেক শ্রমিক-কর্মচারীকে সামগ্রিক সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। তা না হলে ব্যক্তিকে আংশিকভাবে চেনা যাবে এবং তার ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত ভুল হবে। তাই, প্রত্যেক ব্যক্তিকে একজন অর্থনৈতিক-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এই স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়।

৫। **ক্রমবর্ধমান জনগণের ও সরকারের চাপ:** শ্রমজীবী মানুষের জন্য ও নিম্ন আয়ের মানুষের জীবন সুন্দর ও আরামদায়ক করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারি পর্যায়ে তাদের জন্য কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জনকল্যাণবাদী নেতা ও সাধারণ জনগণের চাপ শুরু হয়। এই চাপ ক্রমবর্ধমান হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারি পর্যায়ে শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়। সরকারও পরবর্তীকালে আইন করে শিল্প-কল্যাণ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানদের বাধ্য করে। সামগ্রিক বিচারে শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এই চাপ প্রশমনের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হয়।

৬। **দৈব ঘটনার প্রভাব থেকে সুরক্ষা:** দৈব ঘটনা যেমন মহামারি, দুর্ঘটনা, অর্থনৈতিক মন্দা, অকাল মৃত্যু, কোম্পানির বাজার হারানো ইত্যাদি অবস্থায় শ্রমিক-কর্মচারীদের আর্থিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও পারিবারিক বিপর্যয় দেখা দেয়। এমতাবস্থায়, শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শ্রমিক-কর্মচারীদের সহায়তা দিয়ে টিকিয়ে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭। **মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ:** শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শ্রমিক-কর্মচারীদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ফলে, শ্রমজীবী মানুষের কর্মদক্ষতা, প্রতিষ্ঠানের প্রতি অঙ্গীকার ও কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

৮। **দারিদ্র্য দুরিকরণ:** শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে দেশের মানুষের দারিদ্র্য দূর করে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী নাগরিকরা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থিক, বৈষয়িক ও মানসিক সাহায্য পায়। ফলে, তাদের দারিদ্র্য দূর হয়।

৯। **কর্মচারী ঘূর্ণন কমায়:** শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কর্মচারীদের আর্থসামাজিক, বৌদ্ধিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা দেয় বলে কর্মচারীরা সন্তুষ্ট থাকে। ফলে, তাদের কাজ ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা ও হার কমে যায়। এ কারণে কর্মচারী ঘূর্ণন কমানোর ক্ষেত্রে শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ।

১০। **কাজের প্রতি অঙ্গীকার বৃদ্ধি:** শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কর্মচারীদের নানা অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করে। ফলে, শ্রমিক-কর্মচারীরা বৈষয়িক ও মানসিক সচ্ছলতা পায় এবং সে কারণে কাজের প্রতি তাদের অঙ্গীকার বৃদ্ধি পায়। এ প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের ও দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও শিল্প শান্তির জন্য শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অতীব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

১১। **সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখে:** অসচ্ছল, বেকার ও অক্ষম নাগরিকদের সম্মানজনক জীবনযাত্রার জন্য রাষ্ট্র নানা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানও সামাজিক নিরাপত্তার অধীনে আবাসন সুবিধা বা ভাতা, পরিবহণ সুবিধা, কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করে শ্রমিক-কর্মচারীদের

সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শ্রমিক-কর্মচারী তথা নাগরিকদের সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এবার আমরা শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব।

শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ

Classification of Industrial Welfare and Social Security

শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ সম্পর্কিত আলোচনা দুই ভাগে ভাগ করে করা হবে। প্রথম ভাগে শিল্প-কল্যাণ এর প্রকারভেদ ও পরের ভাগে সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ নিয়ে বর্ণনা থাকবে। তা হলে প্রথমে শিল্প-কল্যাণ এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করি।

শিল্প-কল্যাণ কার্যক্রমকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে বিধিবদ্ধ, স্বেচ্ছামূলক, পারস্পরিক ও সামাজিক শিল্প-কল্যাণ। এগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো -

১। বিধিবদ্ধ শিল্প-কল্যাণ (Statutory Welfare)

সরকার শ্রম আইন, কারখানা আইন, বিধি ইত্যাদি প্রণয়ন করে শিল্প-কল্যাণে বিধান বাধ্যতামূলক করতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকার বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩ -তে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য রক্ষা, প্রসূতি কল্যাণ, স্বাস্থ্যবিধি ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নির্দেশ করেছে। এ সকল আইনগত বাধ্যবাধক বিধি-বিধানকে বিধিবদ্ধ শিল্প-কল্যাণ বলে।

২। স্বেচ্ছামূলক শিল্প-কল্যাণ (Voluntary Welfare)

শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্বউদ্যোগে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এগুলো সরকারি আইনের বাধ্যবাধক সুবিধার অতিরিক্ত সুবিধা। যেমন কোম্পানির পণ্যের বাট্টা দোকান, প্রশিক্ষণ, পরিবহণ সুবিধা, লাইব্রেরি সুবিধা ইত্যাদি। শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রচলিত এ সকল কল্যাণ কার্যক্রমকে স্বেচ্ছামূলকশিল্প-কল্যাণ বলে।

৩। পারস্পরিক শিল্প-কল্যাণ (Mutual Welfare)

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকসংগঠনগুলো শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য নানা কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। যেমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করে শ্রমিকদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে, নিজেদের জন্য সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে পারে, সমবায় দোকান দিতে পারে, আবাসন প্রকল্প করতে পারে ইত্যাদি পারস্পরিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা করতে পারে। এ সকল পদক্ষেপকে পারস্পরিক শিল্প-কল্যাণ বলে।

৪। সামাজিক কল্যাণ (Social Welfare)

কিছু শিল্প-কল্যাণ কার্যক্রম আছে যেগুলোতে শ্রমিক-কর্মচারীদের অবদানের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান অবদান রাখে। যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রুপ বিমা ইত্যাদি প্রকল্পে শ্রমিক-কর্মচারীরা যে পরিমাণ অর্থ অবদান রাখে, প্রতিষ্ঠানও সেই পরিমাণ অর্থ অবদান দেয়। আবার শ্রমিক-কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের সময় তাদের দীর্ঘদিনের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে গ্র্যাচুইটি দিয়ে থাকে। এছাড়া, আইনের বিধান অনুসারে প্রাপ্য অর্জিত ছুটি যদি কেউ ভোগ না করে, তবে অবসরের সময় পুঞ্জিভূত অর্জিত ছুটির কয়েক মাসের মূল বেতনের সমান অর্থ ঐ শ্রমিক-কর্মচারীকে দেওয়া হয়। এ সকল কাজ ভবিষ্যত অনিশ্চিত অবস্থা থেকে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিরক্ষা দেয়। এ জন্য এ সকল পদক্ষেপকে সামাজিক শিল্প-কল্যাণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

এবার শুরু হবে সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ নিয়ে বর্ণনা।

সামাজিক নিরাপত্তার প্রকারভেদ

সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রমকে পাঁচটি বড় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে সামাজিক বিমা সামাজিক সহায়তা, পারিবারিক সুবিধা, স্বাস্থ্য সেবা ও অন্যান্য সামাজিক সেবা। এগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো:

১। সামাজিক বিমা (Social Insurance)

সামাজিক বিমা নাগরিকদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে করা হয়। বিমাকৃত নাগরিক বিমার আংশিক বা পূর্ণ কিস্তি পরিশোধ করতে পারে। এই বিমার মাসিক কিস্তির পরিমাণ বিমাকৃত ব্যক্তির পরিশোধ-ক্ষমতার মধ্যে রাখা হয়। এই বিমার মাসিক কিস্তির একটা অংশ সরকার পরিশোধ করে। এই বিমা সকল নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক। এই

বিমার অধীনে নানা সুবিধা পাওয়ার পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। এই বিমা তহবিল থেকে বিমার সুবিধাভোগীকে অসুস্থ্যতা, আঘাত, প্রসূতি অবস্থা, বেকারত্ব, বৃদ্ধ বয়স ইত্যাদি সময়ে আর্থিক সুবিধা ও পেনশন সুবিধা প্রদান করে সুবিধাভোগী ও তার পরিবারকে বিপদের সময় রক্ষা করে।

২। সামাজিক সহায়তা (Social Assistance)

সামাজিক সহায়তা পুরোপুরি সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করে। এটি নগদ বা মালে প্রদান করা হয়। সামাজিক সহায়তা আয়ের উৎসভিত্তিক বা আয় পরীক্ষা করে দেওয়া হয়। যে সকল নাগরিকের আয় সাময়িক বন্ধ হয়ে গেছে, বেকার, আয় যথেষ্ট নয়, দুঃস্থ, বৃদ্ধ ইত্যাদি তারা এই সামাজিক সহায়তা পায়। এটি জাতীয় ও স্থানীয় সরকার প্রদান করে।

৩। পারিবারিক সুবিধা (Family Benefits)

সামাজিক নিরাপত্তার মধ্যে পরিবারকেন্দ্রিক কিছু সুবিধা প্রদান করা হয়। এ সুবিধার আওতায় [ক] নারীদের অস্থায়ী প্রয়োজন মেটানোর জন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়; যেমন মেয়েদের এককালীন বিবাহ মঞ্জুরি; বিবাহিত নারীদের জন্য মাতৃত্ব মঞ্জুরি ও সুবিধা; পুনরায় খাপখাওয়ানোর জন্য অস্থায়ী বিধবা সুবিধা; বিধবাদের শিশু থাকলে তাদের পরিচর্যার জন্য অভিভাবকত্ব সুবিধা; বিধবাদের কর্ম সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধা, পারিবারিক কাজ করতে অসমর্থ্য মহিলাদের জন্য সবেতনে লোক নিয়োগ ইত্যাদি। [খ] মৃত ব্যক্তির সৎকার করতে অসমর্থ পরিবারের জন্য সৎকার মঞ্জুরি। [গ] শিশুভাতা, ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত। এ ছাড়া নানা দেশে নানা নামে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য আরও অনেক পারিবারিক সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

৪। স্বাস্থ্য সেবা (Health Care)

স্বাস্থ্য সেবা একটি সরকারি ব্যবস্থা। জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা একটি সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে রোগী, পরিবার, গোত্র ও সর্বসাধারণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হয়। এ কার্যক্রমে শারীরিক ও মানসিক রোগ, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা ইত্যাদি রোগে ডাক্তার ও হাসপাতাল সুবিধা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, ডাক্তারের কাছে ও হাসপাতালে আনা-নেওয়ার জন্য অক্ষম ব্যক্তিদের এ্যামবুলেন্স সেবাও প্রদান করা হয়। দুর্ঘটনায় নিপতিত ব্যক্তিদের জরুরি এ্যামবুলেন্স পরিবহন সেবা ও চিকিৎসা দেওয়া হয়। ঔষধপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয়। জাতীয় স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে দাঁতের চিকিৎসাও পাওয়া যায়। এই জাতীয় স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে ঔষধের দামও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অনেক দেশে আংশিকভাবে ও ভিন্নভাবে এই স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হয়। যেমন আমাদের দেশে জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা না থাকলেও সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হাপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিক, মাতৃসদন, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র ইত্যাদিতে বিনামূল্যে ডাক্তারের সেবা, পরিচর্যা ও ঔষধপত্র দেওয়া হয়। অনেক দেশে আবার সর্বজনীন স্বাস্থ্য বিমার মাধ্যমে চাকুরিজীবীসহ সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হয়। সকল নাগরিককে মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনার জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য বিমা বা জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করা হয়।

৫। অন্যান্য সামাজিক সেবা (Other Social Services)

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন আপৎকালীন অবস্থায় বা বিশেষ অবস্থায় নাগরিকদের সহায়তা করা হয়; যা অন্যান্য সামাজিক সেবার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির ভয়াল আক্রমণের সময় সরকার সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিয়ে লকডাউন,কার্ফু ইত্যাদি ঘোষণা করে। এমতাবস্থায়, বিপুল সংখ্যক নাগরিক চাকুরি হারিয়ে অস্থায়ীভাবে বেকার হয়ে পড়ে, অনেকে কাজ হারিয়ে আয় হারায়, অনেকে চাকুরিচ্যুত হয় ইত্যাদি নানা বিপর্যয় দেখা দেয়। সরকার তখন বিশেষ ভাতা দেয়, ঘরে ঘরে বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয়, প্রস্তুত করা খাবার পৌঁছে দেয়, বিনামূল্যে হাসপাতাল সেবা দেয়, চিকিৎসা ও ঔষধ দেয়। এ ছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ; যেমনঃ ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদিতে ঘরবাড়ি, গাড়িঘোড়া, গবাদি পশু, খাদ্যশস্য, খাদ্যসামগ্রী, পারিবারিক সম্পদ ইত্যাদি নষ্ট হলে সরকার বিশেষ ত্রাণ সাহায্য, আর্থিক সহায়তা ও মালামাল সুবিধা প্রদান করে। এ সকল কর্মকাণ্ডকে অন্যান্য সামাজিক সেবা হিসেবে গণ্য করা হয়।

সারসংক্ষেপ

শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন ও মজুরির অতিরিক্ত যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করে তাদের আর্থিক উন্নতি, সামাজিক, নৈতিক অবস্থার প্রসার ও মানসিক প্রশান্তির উন্নয়নসাধন করা হয় এবং ভৌত সুবিধার উন্নয়ন করার জন্য যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, সেগুলোকে সামগ্রিকভাবে শিল্পীয় বা কর্মচারী কল্যাণ বলা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা বলতে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ নেই এমন দৈব বিপত্তির বিরুদ্ধে মানুষকে প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তাকে বোঝায়। শিল্প-কল্যাণ ব্যবস্থা কতকগুলো উদ্দেশ্য হলো: মানবীয় কল্যাণ, আর্থিক কল্যাণ, নাগরিক কল্যাণ, সামাজিক কল্যাণ ও বিনোদন। সামাজিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্যাবলি হলো: শ্রমিক-কর্মচারীদের দৈব দুর্যোগে নিরাপত্তা দেওয়া, আর্থিক সহায়তা, সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করা, পরিবার প্রতিপালনে সহায়তা দান, বিমা সুবিধা প্রদান করা, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও বার্ধক্যে সহায়তা করা। শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুত্ব অনেক। এটি উত্তম জীবনযাপন মান, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শ্রমশক্তির স্বীকৃতি, শ্রমিক-কর্মচারীকে সামগ্রিক সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি, ক্রমবর্ধমান জনগণের ও সরকারের চাপ, দৈব ঘটনার প্রভাব থেকে সুরক্ষা : দৈব ঘটনা যেমন মহামারি, ঝড়, বন্যা ইত্যাদি। শিল্প-কল্যাণ কার্যক্রমকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে বিধিবদ্ধ, স্বেচ্ছামূলক, পারস্পরিক ও সামাজিক শিল্প-কল্যাণ। সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রমকে পাঁচটি বড় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে সামাজিক বিমা, সামাজিক সহায়তা, পারিবারিক সুবিধা, স্বাস্থ্য সেবা ও অন্যান্য সামাজিক সেবা।

পাঠ ৭.২ শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা : কার্যক্রম ও সমস্যা
Industrial Welfae and Social Security: Activities and Problems

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গৃহীত কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার সমস্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সেবার জন্য বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।

আমরা জানি শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা হলো শ্রমিক- কর্মচারীদের মানসিক বা সামাজিক স্বস্তি ও উন্নয়নের জন্য মজুরির অতিরিক্ত প্রদত্ত সুবিধা এবং জীবনকে সুন্দর করার কাজ ও ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ নেই এমন দৈব বিপত্তির বিরুদ্ধে মানুষকে প্রদত্ত সামাজিক প্রতিরক্ষা। এ সম্পর্কিত বিষয় বর্ণনার ধারাবাহিকতায় শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গৃহীত কার্যক্রম , সমস্যাবলি ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের ভূমিকা এই পাঠে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম আলোচ্য বিষয় হলো শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রম।

শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রমসমূহ
Activities of Industrial Welfare and Social Security

পৃথিবীর দেশে দেশে নানা প্রকার শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রমসমূহ চালু আছে। এ ব্যাপারে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে। সে কারণে আমরা কোনো একটি দেশ নির্দিষ্ট না করে সার্বিকভাবে নানা প্রকার শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করব।

১। **বেকারভাতা:** কোনো শারীরিক, মানসিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন সক্ষম ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে চাকুরির অনুসন্ধান করছে, কিন্তু পাচ্ছে না এবং শুধু চাকুরির উপরই নির্ভরশীল হয়, এবং বয়স ১৮ বছরের কম নয়, তবে সেই ব্যক্তি বেকারভাতা পাবে। বাংলাদেশে বর্তমানে বেকারভাতা চালু নেই।

২। **আবাসন:** সকল কর্মচারী সংগঠন প্রদত্ত আবাসন বা আবাসন ভাতা পায়। বাস্তুহারা পরিবারসহ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আবাসন পায়। বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেছে যে, দেশে গৃহহীন কোনো পরিবার থাকবে না। সকল গৃহহীন পরিবারকে সরকারি উদ্যোগে নির্মিত বাড়ি দেওয়া হবে। বাসস্থান পাওয়া নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এ ছাড়া, সরকারি কর্মচারীরা ব্যাংক থেকে ৭৫ লাখ টাকা পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ ঋণ শতকরা পাঁচ শতাংশ সরল সুদে নিতে পারবেন, যার অবশিষ্টাংশ সরকার ভরতুকি দিবে।

৩। **স্বাস্থ্য সেবা:** স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার নানা ধরন দেখা যায়। চাকুরিরত কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বাস্থ্য ভাতা ও কিছু ক্ষেত্রে হাসপাতাল সেবা পায়। সকল নাগরিক বিনামূল্যে বা সামান্য মূল্যে সরকারি হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিক ইত্যাদিতে সেবা পায়, চিকিৎসা ও ঔষধ পায়। কোনো কর্মচারী বা নাগরিক যদি অসুস্থ হয় বা রোগাক্রান্ত হয়, তাহলে তিনি হাসপাতালে মেডিক্যাল চিকিৎসা পাবেন এবং চিকিৎসার শেষে পুনর্বাসন সুবিধা বা ভাতা পায়। স্বাস্থ্য বিমার মাধ্যমে ডাক্তারের সেবা ও হাসপাতাল খরচ পায়। কতিপয় রোগের রোগ প্রতিরোধক টিকা বা ভ্যাকসিন বিনা মূল্যে সকল নাগরিক পায়। এ ছাড়া, ফ্রি বা যৎসামান্য মূল্যে সরকারি এ্যামবুলেন্স সেবাও পায়। পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতাল ও এ্যামবুলেন্স সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। সারাদেশে আধুনিক কল সেন্টার 'স্বাস্থ্য বাতায়ন' চালু করা হয়েছে। মোবাইল ফোনে ও অনলাইনে চিকিৎসা সেবা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আরও

উন্নত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। ৬০টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা হয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য ২০৩ টি অ্যাডলেসেন্ট ফ্রেন্ডলি হেলথ কর্নার স্থাপন এবং ১৪ টি জেলায় ১৮৯ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা চালু করা হয়েছে। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মধ্যে ২ হাজার ২০০ টিতে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা নিরাপদ প্রসব সেবা চালু করা হয়েছে। এই সেবার আওতায় সার্বিক ব্যবস্থা সরকারি তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে।

৪। **পেনশন:** চাকুরি থেকে অবসর পেলে সকল কর্মচারী পেনশন পায়। তবে, অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পেনশন সুবিধা নেই। কিন্তু যে সব দেশে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু আছে, সে সব দেশে সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চাকুরিজীবী অবসরের পরে পেনশন পাবেন। বাংলাদেশ সরকার সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করার পরিকল্পনা করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে চালু পেনশন ব্যবস্থায় অবসরগ্রহণকারী চাকুরিজীবী যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন পেনশন পাবেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী যতদিন জীবিত থাকবেন তিনি পেনশন পাবেন। তাঁর যদি কোনো অটিস্টিক সন্তান থাকে, তবে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পরে সেই সন্তান যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন সেই সন্তান পেনশন পাবে। বর্তমানে শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মাসিক পেনশন পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। যারা এককালীন পেনশনের অর্থ উত্তোলন করেছেন, তাদের ১৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পেনশন সুবিধা পুনঃস্থাপনের আদেশ জারি করা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং তাদের পরিবার এই সুবিধার আওতায় আসবে।

৫। **ভবিষ্যতহবিল বা প্রভিডেন্ড ফান্ড:** দুই ধরনের ভবিষ্যতহবিল চালু আছে। চাঁদাভিত্তিক ও চাঁদাছাড়া ভবিষ্যতহবিল। চাঁদাভিত্তিক ভবিষ্যতহবিলে কর্মচারী তার মূল বেতনের ১০% চাঁদা দেয়, প্রতিষ্ঠানও ১০% চাঁদা দেয়। এই ২০% চাঁদা ভবিষ্যতহবিলে জমা হয়। আর চাঁদাছাড়া ভবিষ্যতহবিলে শুধু কর্মচারী চাঁদা দেয়। কর্মচারীরা অবসরের সময় সমুদয় অর্থ ও বিনিয়োগ থেকে আয়সহ ফেরত পায়।

৬। **শিক্ষাভাতা:** একটা নির্দিষ্ট শিক্ষা স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থী শিক্ষাভাতা পায়। দশম শ্রেণি পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রী মিড-ডে মিল পায়। বাংলাদেশে সরকার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে সকলের জন্য অবৈতনিক করেছে এবং মেয়েদের জন্য স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করেছে। অনেক স্কুলে স্কুল ফিডিং বা মিড-ডে খাবার প্রকল্প চালু করা হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে তা সকল স্কুলে চালু করার মাধ্যমে সর্বজনীন করা হবে। বাংলাদেশে প্রাইমারি স্কুলের সকল ছাত্রছাত্রী উপবৃত্তি পায়।

৭। **শিশুভাতা:** পরিবারে শিশু জন্ম নিলে সরকারিভাবে শিশুভাতা পায়। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে এই ভাতা প্রদান করা হয়। শিশু যেন সুস্থভাবে বেড়ে উঠে দেশের সম্পদ হতে পারে সে জন্য এই ভাতা পরিবারকে প্রদান করা হয়।

৮। **বৃত্তি:** প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষা বৃত্তি দিয়ে থাকে। অনেক প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় সহায়তা করার জন্য মেধাবৃত্তি দিয়ে থাকে। শ্রমিকদের সন্তানের উচ্চ শিক্ষার জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে অনুদান প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল যোগ্য নাগরিকদের জন্য শিক্ষা বৃত্তি দেওয়া হয়। বাংলাদেশে সরকার প্রাইমারি, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মেধা বৃত্তি দিয়ে থাকে। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে মাষ্টার্স ডিগ্রি, এম.ফিল বা পি.এইচ.ডি করার জন্য বঙ্গবন্ধু বৃত্তি চালু আছে। এ ক্ষেত্রে কর্মচারী সবেতনে শিক্ষা ছুটি পায়।

৯। **পরিবহণ:** প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কর্মচারীদের নিরাপদে কর্মস্থলে আনা-নেওয়া করার জন্য পরিবহন সুবিধা দেওয়া হয়। যে সকল প্রতিষ্ঠান পরিবহন সুবিধা দিতে পারে না, তারা পরিবহন ভাতা দেয়। এই ভাতা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দেওয়া হয়। দেশের নাগরিকদের জন্য ভরতুকি দিয়ে সাশ্রয়ী ভাড়ায় সরকার গণপরিবহণ ব্যবস্থা চালু রেখেছে। বাংলাদেশ সরকার কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য পরিবহন সুবিধা বা ভাতা দেয়। পাশাপাশি, এক স্তরের পদমর্যাদা থেকে সকল কর্মচারী গাড়ি কেনার জন্য ৩০ লাখ টাকা সুদবিহীন ঋণ পাবেন এবং পরিচালনা বাবদ মাসিক ৫০ হাজার টাকা পাবেন। তবে, তারা আর সরকারি পরিবহণ সুবিধা পাবে না।

১০। **খাদ্য সাহায্য:** দৈবদুর্বিপাকে পতিত অসহায় মানুষদের জরুরি খাদ্য সাহায্য দেওয়া হয়। মহামারি, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদিতে সহায়সম্বলহীন মানুষদের খাদ্য সাহায্য সরকার করে থাকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও এই ধরনের জাতীয় দুর্যোগে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ত্রাণ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতায় এ সকল কাজ করা হয়। এছাড়া, সারাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান' নামে একটি প্রকল্পের অধীনে ৮ লাখ মানুষের ৮০ দিনের কর্মসংস্থান করা হয়।

১১। **দুর্যোগকালীন সহায়তা:** দৈব দুর্যোগে পতিত সহায়-সম্বল হারা মানুষদের খাদ্য সাহায্যের পাশাপাশি নাগরিকদের দুর্যোগ এলাকা থেকে সরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ভৌত অবকাঠামো তৈরিতে সহায়তা দেওয়া হয়। বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি মেরামত বা নতুন করে তৈরি করে দেওয়া হয়। পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য নগদ অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়।

১২। **গ্র্যাচ্যুইটি:** প্রত্যেক কর্মচারী অবসর গ্রহণের সময় এই গ্র্যাচুইটি পেয়ে থাকে। কর্মচারীর দীর্ঘদিনের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সংগঠনের পক্ষ থেকে এককালীন কিছু অর্থ দেওয়ার নাম হলো গ্র্যাচুইটি। বাংলাদেশে শ্রমিক-কর্মচারীরা শ্রম আইন অনুসারে প্রতি এক বছর চাকুরি বা ছয় মাসের অতিরিক্ত সময়ে চাকুরির জন্য সর্বশেষ প্রাপ্ত মজুরি হারে ন্যূনতম ৩০ দিনের মজুরি গ্র্যাচুইটি হিসেবে চাকুরির অবসানে পাবেন।

১৩। **দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ সুবিধা:** চাকুরিরত অবস্থায় কোনো শ্রমিক-কর্মচারী কারখানায় দুর্ঘটনায় পতিত হলে বা দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ সুবিধা পাবেন। বাংলাদেশে শ্রম আইন অনুসারে শ্রমিক-কর্মচারীরা এই ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকে।

১৪। **বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা:** সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে সকল বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের মাসিক ভাতা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬ সাল থেকে এই ভাতা চালু করেছে।

১৫। **ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সহায়তা:** সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে অতি দরিদ্র পরিবারদের খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়। অনেক দেশে খাদ্য কুপন দেওয়া হয় যা দিয়ে তারা নির্ধারিত দোকান থেকে খাদ্যসামগ্রী নিতে পারে। আবার অনেক দেশে খুবই স্বল্প দামে নির্ধারিত দোকান থেকে খাদ্যসামগ্রী কিনতে পারে। যেমন বাংলাদেশ এই ভিজিএফ কার্ডধারীরা দশ টাকা কেজি দরে মাসে ত্রিশ কেজি চাউল কিনতে পারে। দুস্থ মাতাদের জন্য খাদ্য সাহায্য দেওয়া হয়।

১৬। **কাজের বিনিময়ে খাদ্য:** সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ না দিয়ে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ চাউল বা গম দেওয়া হয়। সাধারণতঃ দৈনিক শ্রমের যে মজুরি পাওয়া যায়, তা দিয়ে ঐ পরিমাণ চাউল বা গম কেনা যায় না। এভাবে ভিক্ষা না দিয়ে দরিদ্র মানুষকে তাদের শ্রমের বিনিময় দিয়ে তাদের মর্যাদা রক্ষা করা হয়, আবার সহায়তাও করা হয়।

১৭। **স্বনির্ভর গৃহায়ন:** পৃথিবীতে দেশে দেশে অনেক গৃহহীন পরিবার আছে। এদেরকে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় বাড়ি দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকার এ লক্ষ্যে 'একটি পরিবার, একটি খামার' প্রকল্প ও 'আশ্রয়ণ প্রকল্প' গ্রহণ করে গৃহহীনদের একখণ্ড জমিসহ বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছে। ফলে, একটি পরিবার জমি চাষ ও হাসমুরগীর চাষ করে আয় করতে পারবে এবং প্রকল্পের পুকুরে যৌথভাবে মাছ চাষ করে লাভবান হতে পারবে।

১৮। **মাতৃসদন ও শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র:** উন্নয়নশীল দেশে প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি। তাই, অনেক দেশে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে মাতৃসদন ও শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করে। বাংলাদেশেও অনেক মাতৃসদন ও শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সকল ধরনের নাগরিকদের এই সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে।

১৯। **পারিবারিক ভাতা:** এ সুবিধার আওতায় [ক] নারীদের অস্থায়ী প্রয়োজন মেটানোর জন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়; যেমন মেয়েদের এককালীন বিবাহ মঞ্জুরি, বিবাহিত নারীদের জন্য মাতৃত্ব মঞ্জুরি ও সুবিধা; পুনরায় খাপখাওয়ানোর জন্য অস্থায়ী বিধবা সুবিধা; বিধবাদের শিশু থাকলে তাদের পরিচর্যার জন্য অভিভাবকত্ব সুবিধা; বিধবাদের কর্ম সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধা, পারিবারিক কাজ করতে অসমর্থ্য মহিলাদের জন্য সবেতনে লোক নিয়োগ ইত্যাদি।

২০। **অটিস্টিক ভাতা:** সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় অটিস্টিক শিশুদের বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, আর্থিক সহায়তা, শিক্ষাগত সহায়তা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি দেওয়ার মাধ্যমে স্বনির্ভর করা হয় ও বিশেষ চাকুরি সংরক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, অটিস্টিক শিশুদের সুরক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সকল বিভাগীয় সদরে সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়েছে এবং প্রতিবন্ধীদেরকে কারিগরি, সেলাই, নাচ ও গান, চারু ও কারুকলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে ঋণ ও অনুদান প্রদান করার ব্যবস্থা আছে।

২১। **পঙ্গু ও শারীরিকভাবে অক্ষম ভাতা:** কাজের বয়স আছে এমন কোনো ব্যক্তি যদি অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার কারণে আয় করার মতো কাজ করতে অসমর্থ হয়, তা হলে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় তিনি অক্ষমতা ভাতা পাবেন। যদি এই দুর্ঘটনা শিল্পে কাজ করার সময় ঘটে থাকে এবং তিনি যদি পঙ্গু হয়ে কাজে অসমর্থ হন, তা হলে শিল্প-কল্যাণ ব্যবস্থার আওতায় তিনি অক্ষমতা পেনশন পাবেন।

২২। **সৎকার ভাতা:** কোনো মৃত নাগরিকের সৎকার করার ব্যয় সম্পাদন করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে সৎকার মঞ্জুরি দেওয়া হয়। এই মঞ্জুরি অসমর্থ ব্যক্তি বা পরিবারের জন্য দেওয়া হয়।

২৩। **মাতৃত্বকালীন ভাতা:** সকল নারী নাগরিক সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় মাতৃত্বকালীন ভাতা পায়। বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধিত) আইন ২০১৩ অনুসারে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারী কর্মচারীরা ছয় মাস সবেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি পায়।

২৪। **গ্রুপ বিমা:** শিল্প প্রতিষ্ঠান স্বউদ্যোগে শিল্প-কল্যাণ স্কিমের আওতায় এই গ্রুপ বিমা চালু করে। এই বিমার অধীনে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই গ্রুপ বিমায় বিমাকৃত কর্মচারীর মৃত্যু হলে নির্ধারিত টাকা তার পরিবার পাবে। আবার অবসরের সময় বিমাকৃত কর্মচারী তার প্রদত্ত প্রিমিয়ামের টাকা ফেরত পাবেন। বাংলাদেশ সরকার শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ -তে এই আইনের আওতাভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক গ্রুপ বিমা চালু করার বিধান (ধারা-৯৯) দিয়েছে।

২৫। **পেশাগত ব্যাধি ভাতা:** শ্রম আইনের বিধান অনুসারে কোনো কর্মচারী কাজ করার সময় পেশাগত ব্যাধির কারণে অসুস্থ্য হলে তার চিকিৎসার ব্যয় প্রতিষ্ঠান বহন করবে। শিল্প-কল্যাণ ব্যবস্থার আওতায় প্রতিষ্ঠান এই বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন করে।

২৬। **প্রাতিষ্ঠানিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা:** শ্রম আইনের বিধান অনুসারে এই আইনের আওতাভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক চিকিৎসা, ধৌতকরণ সুবিধা, ক্যান্টিন, বিশ্রাম কক্ষ, শিশু কক্ষ, চা বাগানে বিনোদন ও শিক্ষার সুবিধা, আবাসন সুবিধা, প্রসূতি কল্যাণ ইত্যাদিসহ অন্যান্য কল্যাণমূলক সুবিধা থাকতে হবে। বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ তে এ সকল সুবিধা রাখা বাধ্যতামূলক।

২৭। **দলিত, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অবহেলিত গোষ্ঠী ভাতা ও সহায়তা:** দেশের অবহেলিত ও অসুবিধাগ্রস্ত নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে বিশেষ আর্থিক ভাতা, প্রশিক্ষণ, চাকুরির কোটা, আবাসন ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে হিজড়া,বেদে, হরিজন, দলিতসহ অন্যান্য অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিশেষ আর্থিক ভাতা দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিনামূল্যে নানা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি অনগ্রসর ও অনুন্নত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত ও চা-বাগান শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা এবং সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়।

২৮। **প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা সহায়তা:** সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দেশের যুব সমাজকে কর্মশক্তিতে রূপান্তর করার জন্য বিনামূল্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ও ঋণ সুবিধা দিয়ে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশে যুব উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের জন্য নানা কর্মমুখী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়, অনুদান দেওয়া হয় ও কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যবস্থা করে যুবসমাজকে দক্ষ, কর্মমুখী ও আত্মনির্ভরশীল করা হয়। লার্নিং-আর্নিং, শি-পাওয়ার, হাইটেক পার্ক, বিসিসি, বিআইটিএম, এলআইসিটি-র সহায়তায় প্রশিক্ষণ দিয়ে যুবক-যুবতীদের ডিজিটাল যুগের উপযোগী মানব

সম্পদে পরিণত করা হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে তাদের জন্য আলাদা ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা,কারিগরি সুবিধা ও সুপারিশসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে। সরকারের 'জয়িতা' ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারীদের সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করা হচ্ছে।

২৯। **অনুন্নত অঞ্চলে কর্মসংস্থান:** পৃথিবীর সবদেশে অনুন্নত অঞ্চলের পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় বিশেষ প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। বাংলাদেশেও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় তুলনামূলকভাবে অতি দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা যথা উত্তরাঞ্চল, উপকূলবর্তী এলাকা ও চরাঞ্চল, হাওড়, বাঁওড় ও চর অঞ্চলের মানুষের জীবিকায়ন করার জন্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে আর্থিক অনুদান ও পরামর্শ দিয়ে তাদের দারিদ্র বিমোচন করা হয়েছে।

৩০। **ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ:** সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় দেশে দেশে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সরকার নির্ধারণ করে দেয়। এই মজুরি দৈনিক বা মাসিক আকারে নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে সরকার ৪৩ টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ৪০টি সেক্টরে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে দিয়েছে। নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের বেতন বৈষম্য করা যাবে না এই মর্মে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৩১। **রেশনিং সুবিধা:** সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় দেশে দেশে অসুবিধাগ্রস্থ নাগরিকদের সহায়তা করার জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু আছে। এখান থেকে তারা স্বল্প মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পায়। বাংলাদেশে গার্মেন্ট শ্রমিকসহ সকল শ্রমিক, হতদরিদ্র এবং গ্রামীণ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরগণ বিশেষ বিবেচনায় নানা পদক্ষেপের সঙ্গে রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে খুবই কম দামে চাউলসহ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পেয়ে থাকে।

৩২। **শিক্ষা উপকরণ সহায়তা:** বাংলাদেশে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অধীনে শতভাগ শিশুকে স্কুলে আনার জন্য প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ী, দাখিল, ভোকেশনাল স্তরের দশম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থী বিনামূল্যে বই দেওয়া হয়। সর্বমোট ২৬০ কোটি ৮৫ লাখ ৯১ হাজার বই বিতরণ করা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থী বছরে একবার জুতা- জামা-প্যান্ট কেনার জন্য পাঁচশত টাকা করে পায়। ৫ টি নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় বিনামূল্যে ৭৭ লাখ বই বিতরণ করা হয়। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণির ১ লাখ ৪৯ হাজার পাঠ্যপুস্তক ও পঠন-পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীদের জন্য ৯ হাজার ৭০৩ কপি ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়।

৩৩। **ছিন্নমূল শিশুদের সহায়তা:** সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ছিন্নমূল শিশুদের জন্য সহয়তা সব দেশেই দেওয়া হয়। বাংলাদেশে হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য শিশুসদন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, পথশিশুদের পুনর্বাসন ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩৪। **বিনোদন সুবিধা:** সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ ব্যবস্থার অধীনে কমিউনিটি পার্ক, শিশু পার্ক, প্রাকৃতিক পার্ক, চিড়িয়াখানা, আনন্দ পার্ক, পিকনিক স্পট ইত্যাদি তৈরি করে জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে ব্যবহারের সুযোগ দেয়। বেসরকারি উদ্যোগেও অনেক বিনোদন পার্ক ও পিকনিক স্পট গড়ে উঠেছে।

শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার সমস্যাবলি

Problems of Industrial Welfare and Social Security

শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার ও দায়দায়িত্ব পূরণ করার জন্য একটা কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান মানুষের এই পাঁচটি মৌলিক অধিকার সকল দেশে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সর্বজনীন মৌলিক মানবধিকার সনদেও এটি স্বীকৃত হয়েছে। এ কারণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিল্প-কল্যাণ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। এই ব্যবস্থাসমূহের কিছু নীতিগত ও প্রায়োগিক সমস্যা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। এগুলো নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো:

১। **অপর্যাপ্ত সুবিধা:** শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কয়েকটি উন্নত দেশ বাদ দিলে অন্যান্য সকল দেশেই অপর্যাপ্ত। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিগণ যে শিল্প-কল্যাণ সুবিধা পায় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আবার সামাজিক

নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যে ভাতা বা সহায়তা দেওয়া হয় তাতে ভাতাভোগী ব্যক্তি বা পরিবার তার মাসিক নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যয় সংকুলান করতে পারে না।

২। **সঠিক সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ সমস্যা:** অনেক দেশেই ভাতা পেতে পারে এমন ব্যক্তি চিহ্নিত করার সমস্যার কারণে সঠিক ব্যক্তি ভাতা বা সহায়তা পায় না। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহে এই সমস্যা প্রকট। ফলে, যার দরকার সে ভাতা সুবিধা পায় না, আর যার প্রয়োজন নেই সে ভাতা পায়।

৩। **সংখ্যা সীমিত:** দেশের সকল যোগ্য নাগরিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভাতা ও সহায়তা পায় না। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে স্বল্প সংখ্যক নাগরিককে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে আনা সম্ভব হয়েছে। এখনও বিপুল সংখ্যক মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাইরে আছে।

বাংলাদেশে শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সেবার জন্য বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা

Role of Differet Parties for Welfare and Social Security Services in Bangladesh

ক) সরকারপক্ষের ভূমিকা

সরকার সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের মূল চালিকা শক্তি। সরকার সংসদে এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন না করলে বা নির্বাহী আদেশ জারি না করলে একটা দেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় না। সামাজিক নিরাপত্তা পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রের আবশ্যিক কর্তব্য। কিন্তু সরকার যদি গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণবাদী না হয়, তা হলে তারা এই দায়িত্ব পালন করে না। একমাত্র জনগণের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ জনকল্যাণবাদী, সমাজতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক সরকারই সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে জনগনের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে। অপরদিকে, শিল্প-কল্যাণ যদিও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব, তথাপি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক বা ব্যবস্থাপনা স্বউদ্যোগে খুব কমই এই শিল্প-কল্যাণ কার্যক্রম প্রবর্তন করে। এক্ষেত্রেও সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এবং আইন প্রণয়ন করে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের শিল্প-কল্যাণ কার্যক্রম গ্রহণে বাধ্য করতে হবে। পৃথিবীর সব দেশে সরকার আইন করে এই শিল্প-কল্যাণ কার্যক্রম চালু করেছে।

খ) শিল্প প্রতিষ্ঠান পক্ষের ভূমিকা

শিল্প-কল্যাণ কার্যক্রম শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকদের গ্রহণ করার কথা। শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করার মাধ্যমে তাদেরকে কাজে উৎসাহিত করা যায়, উৎপাদন বাড়ানো যায় এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুগত করা যায়। সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠান লাভবান হয়। কিন্তু শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কল্যাণ সুবিধা অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট হলেও বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানে তা নিতান্তই অপ্রতুল।

গ) শ্রমিকসংঘপক্ষের ভূমিকা

শ্রমিকসংঘ কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। বিশেষ করে তহবিল থেকে ঋণ সুবিধা, বিনোদনের জন্য সংস্কৃতিক সন্ধ্যা, পিকনিক, সন্তানদের মেধা বৃত্তি, প্রশিক্ষণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কল্যাণমূলক কাজ শ্রমিকসংঘ তার সামর্থের মধ্যে করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

আমাদের দেশসহ পৃথিবীর সকল দেশেই শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম নেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় শ্রমিক-কর্মচারীদের তথা সকল নাগরিকের জন্য আবাসন, বিমা, স্বাস্থ্য সুবিধা, বেকারভাতা, শিক্ষা সামগ্রী, মাতৃ ও শিশু কল্যাণ ইত্যাদি হাজার রকম কার্যক্রম নেয়া হয়। তবে সেগুলো অনেক দেশে যথেষ্ট নয় এবং তারা প্রকৃত অভাবী তারা অনেক সময় পায় না। শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সরকার, প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিকসংঘ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। যদিও সিংহভাগ ভূমিকা সরকারকেই রাখতে হবে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১। শিল্প-কল্যাণ বলতে কী বুঝায়?
২। সামাজিক নিরাপত্তা কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করুন।
৩। শিল্প-কল্যাণের উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা করুন।
৪। সামাজিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা করুন।
৫। শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৬। শিল্প-কল্যাণ ব্যবস্থার প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।
৭। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।
৮। শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গৃহীত কার্যক্রম বর্ণনা করুন।
৯। শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার সমস্যাবলি বর্ণনা করুন।
১০। বাংলাদেশে শিল্প-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সেবার জন্য বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা আলোচনা করুন।